CHANDRAKONA VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA

A Project Report on

"Sharecropping in Chandrakona-II with Specific Focus on Contemporary Potato Cultivation".

Funded By College Authority
(Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya)
Affiliated to Vidyasagar University

PREPARED BY

DEPARTMENT OF HISTORY, CHANDRAKONA VIDYASAGAR MAHAVIDYALAYA

CHANDRAKONA, PASCHIM MEDINIPUR.

Acknowledgement

First of all, we would like to thank our college authority and all esteemed colleagues of our department and faculties of other departments of the college without whose cooperation this project would not have been feasible. Barring it, our students whose dedicated efforts have made this project successful deserve lots of appreciation. We also would like to express our heartfelt gratitude to the people for their unwavering support, engagement and encouragement during the field survey. Last but not least, we would also like to thank all the non-teaching staff of the college for their cooperation and involvement.

Manmohan Guru 17.06.22

Dr. Manmohan Guru (HOD)
Assistant Professor
Department of History
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Ujjal Roy 17.06.22

Ujjal Roy
Assistant Professor
Department of History
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Kakali Ghosh 17.06.2022

Kakali Ghosh
SACT-II
Department of History
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Tuhin Poria 17/06/22

Tuhin Poria
SACT-II
Department of History
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

Rupam Ghosh 17.06.22

Rupam Ghosh
SACT-II
Department of History
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya

ATTESTED
17/6/22
Principal,
Chandrakona Vidyasagar Mahavidyhalaya
Chandrakona :: Paschim Medinipur

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
Acknowledgement	i
জমির মালিকানা রীতি	04
পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদার আইন ,সংশোধন ও কৃষকদের উপর তার প্রভাব	04
চন্দ্রকোনায় আলু চাষের প্রসার ও জমি ভাগ চাষের রীতির পরিবর্তন	06
সমসাময়িক প্রযুক্তির ব্যবহার	08
কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন	13
চাষের আয় ও খরচ	15
আলু ভাগ চাষীদের ঋণের ব্যবস্থা	18
জমির মালিক ও ভাগচাষীদের সম্পর্কের পরিবর্তন	19
আলুর বাজার	21
আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা	23
উপসংহার	25

বর্তমানে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে আলু একটি অন্যতম সবজি। আলু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, পশ্চিমবঙ্গ আলু উৎপাদনে ভারতের দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন, আবার পশ্চিম মেদিনীপুরও পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করে। যদিও 1980 দশকের আগে পশ্চিমবঙ্গে আলু চাষ প্রায় হতো না বললেই চলে। কিন্তু 1980 দশকের আগের ও পরের আলু উৎপাদনে উচ্চহারে বৃদ্ধি যথেষ্ট বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গ মূলত ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এবং ধানই এই রাজ্যের প্রধান কৃষিজাত ফসল এখানে তিন প্রকারের ধান উৎপন্ন হয় তথা আউস, আমন ও বোরো। কিন্তু আশির দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলিতে রবি ফসল হিসাবে আলু উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। আলু যেহেতু শীতকালীন ফসল তাই এই চাষের জন্য বৃষ্টির জলের উপর ভরসা করা যায় না, অন্যদিকে অকালবৃষ্টি আলু চাষে যথেষ্ট ক্ষতিও করে। আলু চাষ মূলত নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত জল সেচের উপর নির্ভর করে। তাই বলা চলে আলু চাষ বৃদ্ধির অর্থ সেচের জমির পরিমাণ এর বৃদ্ধি। আলু চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ যেমন দরকার তেমনি দরকার হয় অধিক পরিমাণ কীটনাশক, পরিচর্যা, জৈবিক ও রাসায়নিক সার। মূলত বেলে বা দোআঁশ মাটি আলু চাষ এর জন্য সবচেয়ে ভালো। যদিও বর্তমানে আলুর দাম বৃদ্ধি পেলে এঁটেল মাটিতেও আলু চাষ করা হয়। বর্তমান সময়ে অনেক উন্নত মানের বীজ যা পাঞ্জাব থেকে আনা হয় তার মাধ্যমে চাষীরা অধিক পরিমাণে উৎপাদন লাভ করতে সামর্থ হয়। জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শীতকালীন আর উষ্ণতার তারতম্য ও কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার কারণে আলুর বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম নাবিধসা, যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চাষিরা ব্যাপক পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সরকার বিভিন্ন প্রজেক্ট এর মাধ্যমে চাষীদের কে বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে ও আধিকারিকরা কিছু জমি পরিদর্শনের মাধ্যমে আলু চাষের বিভিন্ন প্রতিকূলতা গুলিকে কাটিয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

আশির দশকের আগে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রে অচল অবস্থা তৈরি হয়েছিল। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকার সত্বেও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষিবৃদ্ধি অনেকাংশেই নিম্নমুখী ছিল। আশির দশকের পর সেচের এলাকার বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও সারের ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের এই অচল অবস্থা কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। অনেক গবেষক এই পরিবর্তনকে ভারতের সবুজ বিপ্লব ও কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রভাব হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাদের মতে গ্রামীণ সমাজের উপর ভারতের সবুজ বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। যার প্রভাবে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন বর্ধনকারী বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার ব্যাপক পরিমাণে শুরু হয়। সুতরাং এটা বলা যেতেই পারে আশির দশকে নতুন প্রযুক্তি উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষের অগ্রগতির অন্যতম কারণ। তবে এই নতুন প্রযুক্তি গুলি ব্যবহার করার জন্য প্রথম এবং প্রধান মাপকাঠি ছিল অর্থ। সুতরাং জমিদার বা উন্নয়নশীল কৃষক শ্রেণী, যাদের হাতে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল তারাই এই নতুন প্রযুক্তি গুলো থেকে বেশি লাভবান হয়েছেন। অন্যদিকে গরিব কৃষক বর্গাদার বা প্রান্তীয় কৃষক যাদের কাঁচামাল জোগাড় করার ক্ষমতা সীমিত, প্রয়োজনীয় অর্থ ও সেচের জমির অভাব তাদের অবস্থান অবনতি হয়। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের পারিবারিক জমি হারিয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। তাই প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীব কৃষকদের মধ্যে জমির সঙ্গে এক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তৈরি হয়।

কিন্তু সকল স্থানেই যে প্রন্তীয় কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছিল তা নয় অনেক ক্ষেত্রেই ছোট জমির মালিক ও বর্গাদারেরা তাদের জমি শুধু ঠিকিয়ে রাখিনি। আমরা এমন অনেক উদাহরণ পাই যেখানে তারা নিজেদের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করতেও সামর্থ হয়। ঐতিহাসিক জন হ্যারিস দেখিয়েছেন কৃষকদের দরিদ্রকরণ সকল জায়গায় সমান হয়নি। তবে তিনি স্বীকার করেছেন 1980 দশকে বেতনজীবী শ্রমিক এর সংখ্যা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে ছোট জোতের মালিক ও কৃষকরা নতুন প্রযুক্তি সঙ্গে নিজেদের ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার ও নতুন প্রযুক্তিকে

আয়ত্ত করার চেষ্টা সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল। চন্দ্রকোনা সহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পার্শ্ববর্তী বর্ধমান ও হুগলি থেকে আলু ও ধান চাষের সময় বহু ট্রাক্টর ভাড়া খাটতে আসতো। বিশেষ করে যেসব অঞ্চলে 70 দশকের মধ্যভাগ থেকে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে সেখানে অবস্থাপণ্য চাষী ও টিউবয়েলের মালিকেরা দরিদ্র কৃষকের জমি ইজারা নিয়ে তাঁর অধীনে আলু চাষের পরিমাণ বাড়িয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কম জমির মালিক ও ভূমিহীন কৃষকেরা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বা শস্যের একটি ভাগ দিয়ে জমি জমিন ইজারা নিচ্ছে এমন উদাহরণও অনেক পাওয়া যাচ্ছে। আলু চাষে যেমন ধান চাষের তুলনায় বেশি অর্থ লাগে তেমনি কায়িক শ্রম অনেক বেশি দিতে হয়। ফলস্বরূপ আলু চাষের দুটো শ্রেণীর মানুষ বেশি এগিয়ে আছে যাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ আছে ও যারা কাইকশ্রম দিতে পারেন। যাদের অর্থ আছে তারা উন্নত প্রযুক্তি বীজ ও শ্রমিকদের দিয়ে অন্যের জমি ইজারা নিয়ে আলু চাষ এর পরিমাণ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে যে বাড়ির সকলেই আলু চাষে তাদের শ্রম দিতে পেরেছে তারা অন্যের কম পরিমাণে জমিন ইজারা নিয়ে আলু চাষ করেছে।

এই কাজটির উদ্দেশ্য, হল পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা II ব্লকের প্রান্তীয় ও ভূমিহীন কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ করে, আলু চাষের কে নির্ভর করে, এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ণয় করা। এই রচনার মাধ্যমে জমি ভাগ চাষ বা ইজারা নিয়ে চাষ করার সমসাময়িক চিত্রটা তুলে ধরা। এছাড়াও কিভাবে ছোট কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায় আলুর ভাগ চাষের মাধ্যমে জমি চাষ করার সুযোগ পায় ও নিজেদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি করে তা আলোচনা করা। আলু চাষের অর্থনৈতিক ঝুঁকি ও আবহাওয়ার প্রভাব আলোচনা করা। আলু চাষ কিভাবে চন্দ্রকোনার অর্থনীতির মূল ফসল হয়ে উঠল তা আলোচনা করা। তবে এ সকল আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে অনেক পরিবারেরই চাষ ছাড়া আরও অন্য জীবিকার মাধ্যমে পারিবারিক অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধি হয়েছে, তাই একটি পরিবারের সঙ্গে আরেকটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জমির মালিকানা রীতি

চন্দ্রকোণা II ব্লকে যে গ্রামগুলিতে সমীক্ষা করা হয়েছে তা থেকে এই এলাকার জমির মালিকানা সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া গেছে। এই সমীক্ষা গুলিতে দেখা যাচ্ছে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষের কাছে খুব কম পরিমাণ জমি আছে । এছাড়াও অনেক গ্রামেই ভূমিহীন কৃষক এর সংখ্যা প্রায় অর্ধেকের কাছে কাছি, আবার এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে ভূমিহীন কৃষক নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ কৃষক পরিবারের কাছে ন্যূনতম 0.01-3.00 বিঘা জমি আছে। এই এলাকার বেশিরভাগ পরিবারের কাছেই গড়ে তিন বিঘা জমি আছে । অন্যদিকে তিন বিঘা থেকে সাড়ে সাত বিঘা জমি আছে এমন পরিবার 1.5% থেকে 6%, এটা গ্রাম ভিত্তিতে পরিবর্তন হয়েছে। তবে ১৫ বিঘের বেশি জমি আছে এরকম পরিবার বেশিরভাগ গ্রামীণ পাওয়া যায়নি। দু-একটি গ্রামে কয়েকটি পরিবারের হাতে 15 বিঘের বেশি জমি আছে। বর্তমানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির যৌথ পরিবার গুলি ভেঙে যাবার ফলে পরিবার পিছু জমির পরিমাণ কমেছে। গ্রামগুলিতে বিভিন্ন জাতির বাস, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কায়স্থ, সদগোপ, বাগদি, মুচি, জেলে, ডোম, মুসলমান, কর্মকার, বাউরি, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ ও আদিবাসী। আদিবাসী দের মধ্যে সাঁওতাল উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে কৃষিজীবী হিসাবে সদগোপরা অন্যান্য জাতির প্রতিবেশীর থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী। যাদের কাছে এককভাবে জমির একটি বড় অংশ আছে। অন্যদিকে ভূমিহীন মজুর হিসাবে বাগদি, বাউরি, আদিবাসী, মুসলমান ও অন্য কিছু জাতির মানুষ কাজ করে। যদিও এই এলাকার কিছু গ্রামে মুসলমান ও তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবার গুলি যথেষ্ট জমির মালিক ও প্রভাবশালী।

পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদার আইন ,সংশোধন ও কৃষকদের উপর তার প্রভাব

প্রাচীনকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ কৃষি নির্ভর প্রদেশ। এখানে অর্থনীতি প্রথম থেকেই গ্রামীণ ও কৃষি নির্ভর, যদিও বিভিন্ন কুটির শিল্পের যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু উপনিবেশিক শাসকদের অপশাসনের ফলে অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে। জমির মালিকানা নিয়ে

উপনিবেশিক শাসকদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কৃষি ক্ষেত্রকে আরও জটিল করে তোলে। উপনিবেশিক শোষণ ও বিভিন্ন মন্বন্তরের জর্জরিত বাংলার কৃষক গন তাদের নিজের জমি জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের হাতে তুলে দিয়ে সেই জমিতে বর্গাদার হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। ফলে গ্রামগুলিতে নিজের জমি হারিয়ে এই বর্গাদারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

স্বাধীনতার পর ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন কৃষি আইন পাস করেন বর্গাদার ও কৃষকদের অধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। তেমনই 1950 এর বর্গাদার আইন, এখানে বলা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে বর্গাদার কে উচ্ছেদ করা যাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করা যাবে না। 1955 এর ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে জমির মালিক ও বর্গাদারের উদ্‌বৃত্ত ফসলের ওপর ভাগের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়। 1971 খ্রিস্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার জমিতে বর্গাদারের অধিকার ও ভাগের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে। এই আইন অনুসারে যদি সম্পূর্ণ চাষের দায়িত্ব বর্গাদারের ওপর থাকে, তবে বর্গাদার উদ্‌বৃত্ত ফসলের 75 শতাংশ লাভ করবে, আর যদি জমির মালিক সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি সামগ্রী সরবরাহ করে তবে উদ্‌বৃত্ত ফসল এর অর্ধেক পাবে বর্গাদার। এই সংশোধনী আইনে বর্গাদার উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হয় ও বর্গাদারদের বংশানুক্রমিকভাবে জমির উপর অধিকার দেওয়া হয়। যদিও এই আইন দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে বর্গাদার উচ্ছেদ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। জমির মালিক গণ আইন দ্বারা আইন কে ফাঁকি দিতে থাকে, বিভিন্ন অসৎ উপায় অবলম্বন করে বর্গাদার উচ্ছেদ শুরু হয়। ফলে জোতদার দের দ্বারা চাষ করা জমি ও বেতনভোগী শ্রমিক দ্বারা চাষ করা আবাদী জমির পরিমাণ বেড়ে যায়। ফসল ভাগের ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়ম ও নীতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই বর্গাদার চাষের সরঞ্জাম সবই সরবরাহ করলেও তার ভাগে জুটে ছিল অর্ধেক বা তারও কম পরিমাণে ফসল।

1977 সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বর্গাদারদের অধিকার ও সুরক্ষা দেবার জন্য 'অপারেশন বর্গা' নামে বর্গাদারদের নাম লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের এবং তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করার একটা ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। 1978 এর পর লক্ষণীয়ভাবে বর্গাদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এক্ষেত্রেও এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে নাম নথিভুক্তিকরণে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। এছাড়াও বিরোধীদের জমির অন্যায় ভাবে গ্রাস করে নেয়ার কিছু অভিযোগও ওঠে যার মধ্যে কিছু সত্যি বলে প্রমাণিতও হয়।

এখানে গ্রামগুলিতে স্বাধীনতার পর থেকেই বিশেষ করে বর্গাদারদের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য যখন আইন গুলি পাস হতে থাকে তখন থেকেই জমির মালিকগণ বিভিন্ন উপায়ে বর্গাদার উচ্ছেদ করতে থাকে। অস্বীকার করা যায় না যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার সম্ভাবনা ও আসার প্রাথমিক পর্যায়ে বর্গাদার উচ্ছেদ হার বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিক ভাবেই বর্গাদারের সংখ্যা কমে যায়। খুব কম পরিমাণই বর্গাদারিই জমিদারের কাছে কিছু জমি ও অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে লাভ করে। গ্রামগুলিতে জমির মালিক ও বর্গাদারদের মধ্যে বহুদিন পাশাপাশি থাকার ফলে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যা থেকে অনেক বর্গাদারই জমির মালিকের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে চাইনি।

সামগ্রিক ক্ষেত্রে চাষের জমি বন্টনের ব্যক্তি-পিছু পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। যেখানে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে প্রতি ব্যক্তি জমি বন্টনের পরিমাণ ছিল 0.20 একর বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর কমে দাঁড়ায় 0.09 একর। এছাড়াও বেশিরভাগ পরিবার এই বন্টনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

<u>চন্দ্রকোনায় আলু চাষের প্রসার ও জমি ভাগ চাষের রীতির পরিবর্তন</u>

স্বভাবতই সরকার খাতাই-কলমে বর্গাদারের অধিকার এবং জমি বন্ধনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিলেও কার্যক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে 1980 দশক থেকে সেচ ব্যবস্থা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলু চাষের উন্নতির পরিলক্ষিত হতে থাকে। পার্শ্ববর্তী শিলাবতী,

কংসাবতী ও অন্যান্য ছোট নালা পুকুর এর জল পাম্পের মাধ্যমে ও ভূগর্ভস্থ জল টিউবওয়েল সাবমার্সিবেল মাধ্যমে জমিতে সরবরাহ করা হয় এক্ষেত্রে পঞ্চায়েতগুলি বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যায়। ছোট ছোট খাল তৈরি করে বা মেরামত করে বৃষ্টির জল ধরে রাখা এবং কৃষি জমিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও সরকারি বিভিন্ন প্রজেক্ট এর মাধ্যমে জমিতে বারো মাস জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে 1980 দশকের পর থেকেই চন্দ্রকোণায় শীতকালীন রবি ফসল হিসাবে আলু চাষের পরিমাণ ব্যাপক বৃদ্ধি হয়।

আলু চাষের ফলে জমির ইজারা বা ভাগচাষের পদ্ধতি ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আগেই বলা হয়েছে আলু চাষের ব্যাপক পরিমাণে অর্থ নিয়োগ করতে হয় ফলে সকল কৃষকদের পক্ষে আলু চাষ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিছু কৃষক যারা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে এবং বিশেষ করে অন্য শ্রেণীর কৃষক বিশেষ করে ভূমিহীন ও অল্প জমির মালিক কৃষকগণ অন্যের জমি ইজারা নিয়ে ভাগ ভাগ চাষ শুরু করে। 1990 এর দশকে যেখানে ধান চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমন ধানের 95% জমির মালিক নিজে চাষ করত কিন্তু আলু চাষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে উল্টো চিত্র দেখা যায়, আলু চাষের অনেক জমির মালিক অনীহা দেখাতেন। তারা জমি ভাগচাষীদের কে দিয়ে চাষ করাতে বেশি উদ্যোগী ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ভাগ চাষ নেবার ক্ষেত্রে দুটি নিয়ম মেনে চলা হয়। প্রথমত, নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকার বিনিময়ে একজন জমির মালিক অন্য ভাগচষি কে জমিতে চাষ করতে দিত, অন্য নিয়মে জমির মালিক ভাগচষির কাছ থেকে ফসলের একটি ভাগ নেয়। আলু চাষের উৎপাদনের অনিশ্চয়তা সর্বোপরিব উৎপন্ন ফসলের দামের ব্যাপক অনিশ্চয়তার জন্য জমির মালিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফসল ভাগের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণে নগদ টাকা নেয়াকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। তবে গ্রামগুলিতে ফসলভাগ ও নগদ টাকা উভয়ের বিনিময়ে জমি ভাগে দেওয়ার প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। পরিবার ভিত্তিক জমির পরিমাণ দেখলে দেখা যায় প্রায় 7% জমি মাঝারি কৃষকদের হাতে আছে এছাড়াও ভূমিহীন ও কম জমির মালিকদের হাতে প্রায় 20% জমি আছে। অনেক ক্ষেত্রেই ভূমিহীন কৃষকগণ বড় ও মাঝারি

কৃষকদের থেকে জমি নিয়ে ভাগ চাষ করছে। অনেক মাঝারি ও বড় জমির মালিকেরাও ছোট কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে ভাগ চাষ করছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে যে জমির চাষের অধিকার নির্দিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে অনেক গরিব ভুমিহীন চাষী ও আলু চাষ করছে এবং তারা অন্যের জমি ইজারা নিয়েও চাষ করছে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

2000 সালের পর থেকে আলু চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হয়, যেখানে আলুর দাম 2006 সালে পার কুইন্টাল 400 টাকা অতিক্রম করে এরপর থেকেই আলু চাষের প্রতি কৃষকদের ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং আলু একটি অর্থকারী ফসল হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে উন্নত ভাবে আলু সংরক্ষণের জন্য সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি উদ্যোগে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন আলু অতিরিক্ত উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হলে আলু চাষের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ আরো ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়।

যদিও আলু চাষের বিভিন্ন প্রতিকূলতা বিশেষ করে আবহাওয়ার পরিবর্তন ও অসময়ে বৃষ্টিপাত আলু চাষের ও চাষীর বিভিন্ন সময় ব্যাপক ক্ষতি করে। তার সত্বেও বেশিরভাগ বছরই যেহেতু আলু কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করে তাই রবি ফসল হিসাবে চন্দ্রকোণা অঞ্চলে আলুকে ব্যাপক পরিমাণে গুরুত্ব দেয়া হয়।

<u>সমসাময়িক প্রযুক্তির ব্যবহার</u>

1980 দশকের আগের পশ্চিমবাংলায় কৃষি উৎপাদন বলতে মূলত ধান পাট কিছু পরিমাণে গম বিভিন্ন তৈল বীজ এবং শাকসবজি চাষ হতো কিন্তু 1980 এর পর কৃষি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন আসে এবং আলু ধীরে ধীরে শীতকালীন একটি অর্থনৈতিক ফসল হিসাবে গড়ে ওঠে এর জন্য সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি ভূমিকা পালন করেছিল তা ছিল প্রযুক্তির ব্যবহার।

চিত্র নম্বর-01: ক্ষেত্রসমীক্ষা

চিত্র নম্বর-02 : যন্ত্রের ব্যবহার

বলতে গেলে এই অঞ্চলের আলু চাষের সূত্রপাত ও জনপ্রিয়তা লাভের মূলে আছে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার। নতুন নতুন প্রযুক্তি যেমন উন্নত মানের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক সেচ ব্যবস্থা বিভিন্ন চাষের যন্ত্রপাতির ব্যবহার আলু চাষকে এই অঞ্চলে একটি নতুন মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

ধান বা পাট চাষ মূলত বৃষ্টি জলের উপর নির্ভরশীল ছিল যে বছর বর্ষা ভালো হতো সে বছর ধান চাষ ভালো হতো কিন্তু বর্ষার আধিক্য বা কম বর্ষা হলে ধানের উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে ব্যাহত হত। কিন্তু আলু চাষ ধান চাষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এখানে বর্ষার বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল হওয়ার কোন সুযোগ নেই উপরন্তু হঠাৎ বৃষ্টি আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতি করে এবং আলু গাছের রোগ সংক্রমণ ঘটায় আলু পচে যায় ফলে চাষিরা সমস্যায় পড়ে। আলু চাষের জন্য প্রয়োজন নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত জলসেচ এর জন্য আলু চাষের জন্য পর্যাপ্ত জলের যুগান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। চন্দ্রকোনা II ব্লকের শিলাবতী নদীর পাশাপাশি কিছু খাল বিল ও জলাশয় প্রাচুর্য থাকায় জল সংরক্ষণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল। এটা আরো সম্ভব হয়েছিল তদানীন্তন সরকার ও পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জলাশয় গুলির সংস্কারের ফলে জলাশয় গুলির জল ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি হলে বর্ষার জল শীতকাল পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব হয়।

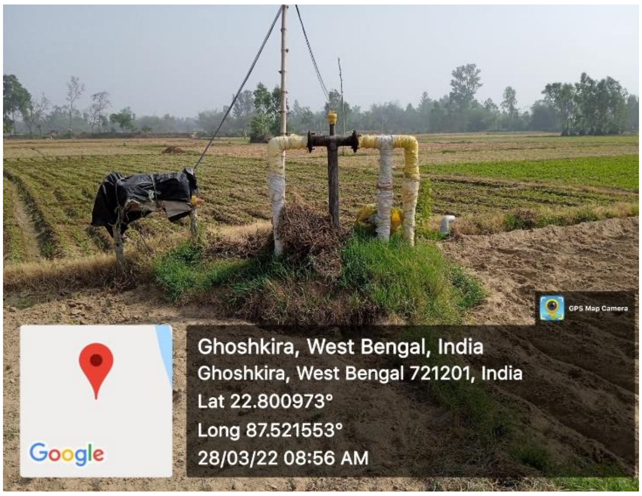

চিত্র নম্বর-03: সাবমারসিবল

চিত্র নম্বর-04: সেচ ব্যবস্থা

এছাড়াও সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে টিউবওয়েল, সাবমারসিবল ব্যবস্থা করাতে এতদিন পর্যন্ত যে জমি পর্যন্ত জলাশয় বা নদীর জল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি সেখানেও খুব সহজেই ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে সেচের জল পৌঁছানো সম্ভব হয়। এই সেচ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে ভাগ চাষ এর একটি ব্যাপক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যে গ্রামের সরকারি উদ্যোগে সেচের জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, খাল, জলাশয়, নদীর বা ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে। সেই সব গ্রামের ছোট চাষিরা, বড় জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি ইযারা নিয়ে আলু চাষ করছে। অন্যদিকে যে গ্রামগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে টিউবওয়েল বা সাবমারসিবল এর মাধ্যমে সেচের জল সরবরাহ করা হয় এই সকল গ্রামে বিত্তবান জমির মালিকগণ ক্ষুদ্র কৃষকদের থেকে জমি ইজারা নিচ্ছে।

অদ্‌ভুত ভাবে লক্ষ্য করা যায় ব্যক্তিগত সেচের সুবিধা পাওয়া এলাকার জমিগুলি বেশির ভাগেই সেচ প্রকল্পের মালিকগণ টাকার বিনিময়ে ইজারা নিয়ে নিজেদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ বাড়াচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই গরিব ক্ষুদ্র চাষীদের উপর জোর খাটিয়ে তাদেরকে এই জমি ক্ষমতা সম্পন্ন বিত্তবান কৃষকদের ইজারা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে । অন্য কোনো জল সেচের সুবিধা না পাওয়ায় এই গ্রামের গুলোর দরিদ্র কৃষকরা এই বৃত্তবান দের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য

হচ্ছে। যেখানে সরকারি প্রকল্প এর সুবিধা আছে সেই অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা এই গ্রামগুলি থেকে ভালো ছিল। সরকারি সেচ প্রকল্পের আওতায় জলাশয় ও নদীগুলি থেকে জল তোলার জন্য কৃষকরা ডিজেল বা কেরোসিন চালিত ছোট পাম্পে ব্যবহার করে । যদিও এই ধরনের পাম্পের মালিকের সংখ্যা খুবই কম তাই অন্যান্য কৃষকরা পাম্প ভাড়া করে। এই পাম্প গুলির খরচ অনেক কম ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে অনেক সুবিধা থাকায় কৃষকদের মধ্যে পাম্প গুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়। তাই সরকারি সেচ প্রকল্পের আওতায় থাকা গ্রামগুলিতে আলু চাষের ক্ষেত্রে দরিদ্র কৃষকদের দেখতে পাওয়া যায়।

আলু চাষে জন্য জমি প্রস্তুত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সাধারণভাবে বেলে ও দোআঁশ মাটিতে আলু চাষ ভালো হয়। এই মাটি প্রস্তুতি জন্য আগে গরু বা মোষের লাঙ্গল ব্যবহার করা হতো যা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ও খরচ সাপেক্ষ। 1980 দশকের পর থেকে কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, বিশেষ করে জমি প্রস্তুত এর জন্য ট্রাক্টর জেলায় কম থাকায়, পাশাপাশি কৃষি প্রধান জেলা গুলি বিশেষ করে বর্ধমান ও হুগলি থেকে ট্রাক্টর এখানে আসতো এবং ঘন্টা হিসেবে ভাড়ার বিনিময়ে কৃষি জমি প্রস্তুত করত।

চিত্র নম্বর-05: আলু চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্র

চিত্র নম্বর-06: কৃষি জমি চাষের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

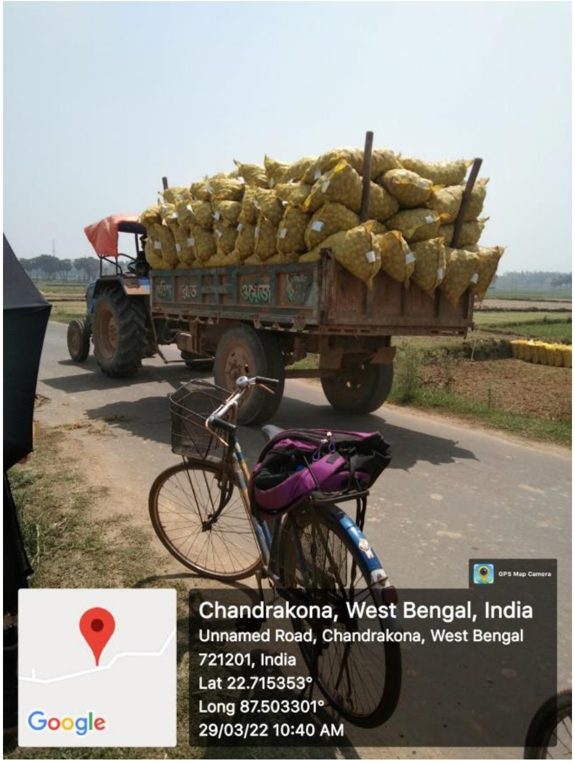

চিত্র নম্বর-07: উৎপাদিত আলু বাজারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে যদিও গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তি ট্রাক্টর কিনে ভাড়া খাটায়। দরিদ্র কৃষকরা ট্রাক্টর ভাড়া করে নিজের জমি প্রস্তুত করে যদিও আলু তোলার সময় এখনো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গরুর লাঙ্গলের ব্যবহার করা হয়। যেহেতু আলু চাষের ক্ষেত্রে জমির মাটি প্রস্তুতির জন্য বেশ কয়েকবার জমি চাষ দেয়া প্রয়োজন, যেটা গরু বা মোষের লাঙ্গলে সময় সাপেক্ষ ছিল, ট্রাক্টর আসার ফলে এটি অনেক সহজ হয়ে গেছে, ফলে একই সঙ্গে অনেক বেশি জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হচ্ছে যা আলু চাষের পরিধিকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করে।

<u>কৃষকদের অর্থনৈতিক পরিবর্তন</u>

ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জমির ইজারা নিয়ে ভাগ চাষ করার একটা বড় কারণ হচ্ছে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, ও কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য জীবিকার মাধ্যমে পারিবারিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হয়েছে। ফলে ওই পরিবারগুলি অন্যের জমিন ঠিকায় নিয়ে ভাগচাষ শুরু করেছে। ১৯৮০ দশকের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শ্রমিকদের মজুরির লক্ষনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1970 এর দশকে যেখানে পুরুষ কৃষিজীবীদের দিনমজুরি ছিল চার টাকা যা 1.5 থেকে 2 কিলো চালের দামের সমান, কিন্তু 1995 এ মজুরি ছিল 32 টাকা যা চার থেকে 5 কিলো চালের সমমূল্য। 2019 সালে এই মজুরি ছিল 280 থেকে 300 টাকার মধ্যে যা 8 থেকে 9 কিলো চালের সমমূল্য। এছাড়াও রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বাজার, দোকান ও অন্যান্য জীবিকার আবির্ভাব। কৃষি ক্ষেত্রে স্বল্প মেয়াদী উন্নত ধানের চাষ অন্যান্য সবজি চাষের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে যেমন জমি চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে গ্রামগুলি তে বিভিন্ন নতুন পেসার আবির্ভাব গ্রামের স্বল্প জমির মালিক বা ভূমিহীন কৃষকদের শহর মুখি করে তুলেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে 100 দিনের কাজ বা মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ সরোজগার যোজনা এর মূল উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষদের কাজ সুনিশ্চিত করা হলেও এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে কৃষি শ্রমিকের মজুরি উত্তর

উত্তর বাড়তে থাকে। শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি মাঝারি ও ছোট কৃষকদের সবচেয়ে বেশি প্রতিকূলতা মধ্যে ফেলে, তাদের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় শ্রমিক দিয়ে আলু চাষ করানো তাদের কাছে আর লাভজনক হচ্ছিল না। এই সকল কৃষকরা তাদের জমি সেই সব ভাগ চাষিকে দিয়ে দেয় যারা সপরিবারে জমিতে শ্রম দিতে পারে অথবা বড় কৃষক যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আছে।

2000 সালের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিকাঠাময় যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। উন্নত রাস্তাঘাট যোগাযোগব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হতে থাকে ব্যাপক না হলেও লক্ষনীয়ভাবে। ফলে গ্রাম মফঃস্বল এবং ছোট শহর গুলিতে বিভিন্ন জীবিকার উৎস গড়ে ওঠে। চন্দ্রকোণা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দরিদ্র পরিবার গুলি ছেলেদের মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সোনার কাজ শেখার জন্য পাঠানো একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে ওঠে। এই সকল শ্রমিকরা বাইরের সোনার কাজ করে বাড়িতে তাদের উদ্‌বৃত্ত টাকা পাঠাতো যা থেকে গ্রামের দরিদ্র পরিবার গুলি ধীরে ধীরে সম্পদশালী হয়ে ওঠে এবং অনেকেই এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু জমি জায়গা ক্রয় করে অনেকেই ফিরে এসে ছোটখাটো ব্যবসা সাথে সাথেই জমি ভাগ চাষ শুরু করেন। ফলে ওই সকল জমিতে চাষাবাদ করে পারিবারিক সচ্ছলতা লাভ করে। এছাড়াও হাট বাজারের বিস্তার, ছোটখাটো দোকান ও ব্যবসার বিস্তার এই অঞ্চলের আর্থিক উন্নতিতে সহায়তা করে।

কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের বাজার বৃদ্ধি পায় ফলস্বরূপ গ্রামের দরিদ্র মানুষের আর্থিক উন্নতি হতে থাকে যদিও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ফলে তাদের হাতে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে তবুও দ্রব্যমূল মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সব পরিবারের পক্ষে জীবন নির্ভর করা সহজ হয়নি। এখানে যেখানে আমন ধান চাষের প্রতি 20.7 জন মজুর লাগে বোর ধানে একর প্রতি 27.4 জন শ্রমিক লাগে আলু চাষে একর প্রতি 75 জন শ্রমিক লাগে। স্বাভাবিকভাবেই আলু চাষের শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদা একদিকে যেমন শ্রমজীবীদের আর্থিক স্বচ্ছন্দ লাভের একটি পথ দেখাচ্ছে অন্যদিকে যে সকল কৃষক নিজেরা

কৃষিকাজ না করে শ্রমিকদের দিয়ে কৃষি কাজ করাচ্ছে তাদের লাভের সম্ভাবনা ও লাভের হার অনেকটাই কমে যায়।

সমসাময়িক চন্দ্রকোনায় কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশায় আয়ের সম্ভাবনা বেশি হওয়ায় কৃষক পরিবার গুলি যারা এতদিন পর্যন্ত কৃষি কেই তাদের মূল জীবিকা হিসাবে ভাবতো তারা অন্যান্য জীবিকা দিকে ঝুঁকছে। আলুর উৎপাদন এর সঙ্গে আলু চাষের আয়ের একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক হওয়ায়, বিশেষ করে আলু চাষের লাভ সব বছর সমান হয় না বিশেষ করে চাষীদের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তারা লাভের মুখ দেখে আবার কোন বছর উৎপাদন বেশি হলে লগ্নি করা টাকা টুকুও কৃষকেরা পায় না। এর ফলে ঋণ করে যে কৃষকয়আলু চাষ করেছে সেটি শোধ করার সামর্থ্যটুকুও কৃষকের থাকে না। এ কারণে অনেক বছরই আলু চাষীদের আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসে। এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও যেহেতু বেশিরভাগ বছর আলু চাষ ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় তাই চন্দ্রকোনা এলাকার গ্রামগুলিতে কৃষকগণ লাভের আশায় জমি ভাগে নিয়েও আলু চাষ করে।

<u>চাষের আয় ও খরচ</u>

ধান চাষের তুলনায় আলু চাষে শ্রম ও খরচ দুটোই অনেক বেশি খরচের একটি বড় অংশ যায় উন্নত পাঞ্জাবি বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকদের মজুরি, জমির খাজনা, এছাড়াও ট্রাক্টরের জমির চাষ দেবার খরচ। অনেক গরিব চাষির পক্ষে আলু চাষ করার খরচ করার সামর্থ্য না থাকায় তাদের অন্যের কাছে টাকা ধার নিতে হয়। গরিব চাষীরা চাষের জন্য সাধারণভাবে মহাজন, কৃষি ব্যবসায়ী ও আত্মীয়স্বজনের কাছে টাকা ধার নেয়। যেহেতু মহাজন টাকা ধার দেবার পরিবর্তে মাসিক একটি মোটা হারে সুদ দাবি করে তাই চাষিরা সাধারণভাবে মহাজন থেকে টাকা ধার নেবার ব্যাপারে অনেক বেশি সাবধানী। অন্যদিকে কৃষি ব্যবসায়ী শুধু টাকা ধার দেয় না এর সঙ্গে সঙ্গে চাষের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস আলু বীজ রাসায়নিক সার কীটনাশক

এমনকি জমি চাষ দেবার জন্য ট্রাক্টর ও তারাই সরবরাহ করে। চাষের কাজে সহযোগিতা ছাড়াও সারা বছর সাংসারিক খরচ চালানোর জন্য কৃষকরা এই ব্যবসায়ীদের উপরই নির্ভরশীল। বিপদে-আপদে প্রয়োজনে নিত্য প্রয়োজনে অর্থের জন্য কৃষকগণ এই ব্যবসায়ীদের কাছেই হাত পাততে বাধ্য হয়। ব্যবসায়ী গন কৃষকদের এই অসহায়তার সম্পূর্ণরূপে সুযোগ নেয় সারা বছর কৃষকদের দাদন দেবার পরিবর্তে ফসল কেনার সময় কৃষকদের কাছে ফসল কেনার সময় কৃষকদের বাজারদরের তুলনায় কম দামে ফসল বিক্রি করতে এই অসাধু ব্যবসায়ীগণ বাধ্য করে। অন্যদিকে চাষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সময় বাজারের তুলনায় কৃষক গ্রাম এই ব্যবসায়ীদের বেশি দাম দিতে বাধ্য হয় ফলে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরা লাভবান জায়গায় ও কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সার, বীজ কেনার সময় যে অতিরিক্ত মূল্য কৃষকদের দিতে হয় ও উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ের সময় যে কম মূল্যে ফসল বিক্রি করতে হয় প্রকৃত মূল্যের সঙ্গে এই অর্থের পার্থক্য কে ধরাটি বলা হয়। এই 'ধরাটি' দেবার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকদের লাভ অনেক সংকুচিত হয়ে যায়, অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা তাদের লাভের অংশ অনেকটাই বাড়াতে সমর্থ হন।

জমি ভাগ চাষ নেওয়ার ক্ষেত্রে যে দু ধরনের নিয়ম প্রচলিত আছে আগেই বলা হয়েছে। দুই ক্ষেত্রে চাষী চুক্তির মাধ্যমে জমির মালিকের কাছ থেকে জমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা নেয়, এই নির্দিষ্ট সময় কখনো এক বছর বা একটি ফসলের ক্ষেত্রেও হতে পারে চন্দ্রকোণায় দুই অঞ্চলের ব্লকের গ্রামগুলিতে সাধারণভাবে একটি ফসলের জন্য বিশেষ করে আলু চাষের জন্য জমি ভাগ চাষ ইজারা নেওয়ার পরিমাণই বেশি পাওয়া যাচ্ছে। গরিব কৃষকরা যাদের নগদ আয় খুব কম। তারা সাধারণত ফসলের ভাগের চুক্তিতে জমি নিতে বেশি পছন্দ করে কারণ এক্ষেত্রে চাষের আগেই নগদ অর্থ দিতে হয় না। যদি জমির মালিক চাষের খরচ এর অর্ধেক দেয় তবে মালিক উৎপন্ন ফসলের ভাগের অংশ ½ পায়। আর যদি ভাগ চাষী সম্পূর্ণ খরচ করে তবে মালিক সর্বোচ্চ ⅓ অংশ পর্যন্ত পেতে পারে। ফসল ভাগের ক্ষেত্রেও ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য লক্ষ্য

করা যায়। যেহেতু আলু চাষের উৎপাদন আবহাওয়ার কারণে ব্যাঘাত ঘটে বিশেষ করে অকালবৃষ্টি, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া আলু চাষের বিশেষ ক্ষতি করে এবং উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। তাই অনেক জমির মালিক সাবধানী হয়ে ফসলের ভাগের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল দাবি করে। আলুর ক্ষেত্রে বিঘায় 15 থেকে 20 বস্তা। যদিও এই পরিমাণও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদন কম হলে চাষী অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই লক্ষ্য করা যায় যে পরিবারগুলির আয় কৃষি ব্যথিত অন্য উৎস থেকে বৃদ্ধি পায় তখন তারা নগদ অর্থের চুক্তির বিনিময়ে চাষ করতে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে কৃষি ব্যতীত অন্য কোন আয়ের উৎস না থাকলে তারা উপাদিত ফসলের ভাগের চুক্তিতে চাষ করতে আগ্রহী হয়।

ধান চাষের তুলনায় আলু চাষে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা অনেক বেশি লাগে তাই আলু চাষের একটা বড় অংশ ক্ষেতমজুরিতেই চলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই গরিব চাষীদের ক্ষেত্রে এই খরচ যোগানো অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রেই চাষী পরিবারের সকল সদস্যই চাষের জমিতে কাজ করে। অন্যদিকে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো তারা ক্ষেতমজুরের মাধ্যমেই আলু চাষ করে। অনেক ক্ষেত্রেই গরিব চাষীরা একে অপরের জমির চাষ করাতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে ফলে উভয়ই লাভবান হয়। তবে গ্রামের বেশিরভাগ জমি ভাড়াটিয়া ক্ষেতমজুরদের দিয়ে চাষ করানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই যারা সম্পূর্ণ চাষ ক্ষেতমজুরদের মাধ্যমে করে তাদের চাষের খরচের পরিমাণ অনেকটাই বেড়ে যায়। আর যারা পরিবারের সদস্যদের শ্রমিক হিসাবে ব্যবহার করে তাদের পক্ষে বেশি জমি চাষ করা সম্ভব হয় না কারণ আগেই বলা হয়েছে আলু চাষের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণ শ্রম লাগে। এই গরিব চাষীদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যতা না, থাকার জন্য তারা এই শ্রমিক ও চাষের খরচা বহন করতে পারে না তাই তারা কম পরিমাণ চাষ করে। গ্রামগুলিতে এমন অনেক পরিবার ও জাতি পাওয়া যায় যারা জাতাভিমান ও বিভিন্ন টোটেম এর জন্য আর্থিক সামর্থ্য না থাকলেও পরিবারের সদস্যদের বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে না।

আলু চাষে যে প্রতিবছর ব্যাপক লাভজনক তা নয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন ও উৎপাদনের হার হিসাবে বিভিন্ন বছর আলুর মূল্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন বছর ব্যাপক লাভ হলেও অনেক বছরই ব্যাপক ক্ষতি হয় বিশেষ করে কৃষকরা আলু উৎপাদনের উৎপাদিত আলু জমি থেকে বিক্রি করে দিলে। আবার আলু কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষিত রাখলে লাভের সম্ভাবনা থেকে যায়, কিন্তু দাদনে টাকা ধার নেয়ার ফলে উৎপাদিত ফসল জমি থেকেই ব্যবসায়ী ও মহাজনরা কিনে নেয়। ফলে আলু সংরক্ষণের সুবিধা থাকলেও বেশিরভাগ কৃষক এই সুবিধা নিতে পারেনা। পরবর্তীকালে আলুর দাম বাড়লে তার সুবিধা মহাজন ও ব্যবসায়ীরা তার লাভ পেয়ে থাকে। আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে আলুর মূল্য উৎপাদনের সময় যেটি ছিল সেটা নেব কারণ দরিদ্র ভাগ চাষীদের পক্ষে আলু সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয় না বললেই চলে। তাই ভাগচাষীদের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য আলু কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণের আগে বা আলু তোলার সময় মাঠে যে দাম পাচ্ছে সেই দাম ধরে হিসাব করলেই প্রকৃত চিত্রটা উঠে আসবে বলে মনে হয়।

<u>আলু ভাগ চাষীদের ঋণের ব্যবস্থা</u>

আলু চাষের ক্ষেত্রে ভাগ চাষী ও জমির মালিক সম্পর্ক পরিবর্তন হয়েছে আগে যেখানে ভাগ চাষী বা বর্গাদার সঙ্গে জমির মালিকের সম্পর্ক ছিল অধীনতা ও নির্ভরতার, কিন্তু পরিবর্তিত সময়ে এই সম্পর্কে পরিবর্তন হয়। 1970 দশকের অনেক গবেষণা থেকে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগ চাষে সাধারণভাবে জমির মালিক জোতদার দের কাছ থেকে ঋণ নিত। জমির মালিক ছাড়াও অন্যান্য ঋণদাতা যেমন মহাজন এদের কাছ থেকেও সুদের বিনিময়ে টাকা ধার নিত। অনেক গবেষক দেখিয়েছেন আশির দশকেও জমি ইজারা চুক্তি ও ঋণ ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক ছিল। তবে কৃষির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। 1990 এর দশকের একটি গবেষণায় হিদেকি মোরি মেদিনীপুরের বোরো ধান চাষের একটি গ্রামের সমীক্ষায় দেখিয়েছিলেন যে গ্রামের অধিকাংশ মানুষই ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে জমির

মালিকের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা ঋণের জন্য নিজেদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা গ্রামের অন্যান্য মানুষের কাছে ধার নিচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ভাগ চাষীগন কোন ঋণ ছাড়াই চাষ করছে এরকম নিদর্শন ও পাওয়া যায়।

তবে ধান চাষের তুলনায় আলু চাষে খরচ অনেক বেশি হওয়ায় অনেক সময় কৃষকরা বাধ্য হয় অন্য জায়গা থেকে চাষের টাকা ধার নিতে এক্ষেত্রে আলু ব্যবসায়ীরায় তাদের ধার দিতে এগিয়ে আসে। আগেই বলা হয়েছে এই ব্যবসায়ীদের কাছে কৃষকরা সারা বছরই তাদের পারিবারিক বিভিন্ন কারণে অর্থ ঋণ নেয়।

জমির মালিক ও ভাগচাষীদের সম্পর্কের পরিবর্তন

অন্যান্য অঞ্চলের মতোই চন্দ্রকোণা II ব্লকে জমির মালিকরা ভাগচাষের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মাত্র একটি ফসল চাষের জন্য বিশেষ করে আলু চাষের জন্য জমি ভাগ চাষ দেয়। ভাগ চাষ দেবার ক্ষেত্রে জমির মালিকগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে, যেমন একজন চাষী কেই তার সব জমি ভাগ চাষ দেয় না, প্রত্যেক বছর একই ভাগচাষীকে একই জমি দেয় না, আবার সারা বছরের জন্য সাধারণভাবে একই ভাগচাষিকে জমি চাষ করতে দেয় না। আবার বছরের পর বছর একই ভাগ চাষীর সঙ্গে চুক্তি না করা। এই সকল সাবধানতার কারণ একটাই ভয় পাচ্ছে ভাগচাষী ওই জমিতে বর্গাদার হিসাবে নিজের নাম নথিভূক্ত না করে ফেলে। সাধারণভাবে ভাগচাষিরা বর্গাদার হবার জন্য আবেদন করে না। গরিব ভাগচাষীর পক্ষে এত আইনি জটিলতায় যাবার সম্ভাবনাও খুবই কম ।

চিত্র নম্বর-08: ফসল তোলা হচ্ছে

কিন্তু জমির মালিকদের ভয় থেকেই যায়। এতো কিছু সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অনেক গ্রামেই কিছু কিছু ভাগ চাষী অনেকবছর ধরে একই মালিকের জমি চাষ করে আসছে।

সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে সকল ভাগ চাষীদের সাথে জমির মালিকের সম্পর্ক ভালো এবং একে অপরকে বিশ্বাস করে। সেক্ষেত্রে একই চাষীকে বছরের পর বছর একই জমি চাষ করতে দেখা গেছে। তবে এই সকল চুক্তির ক্ষেত্রে কোন লিখিত চুক্তি পাওয়া যায় না, সাধারণভাবে মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে জমি ভাগ চাষীকে দেয়া হয়। জমি ভাগ চাষ দেওয়ার পর জমির মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে কোন সমস্যা হলে সাধারণভাবে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ তাদের সমস্যার সমাধান করতে মধ্যস্থতা করে। তবে অনেককে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা পঞ্চায়েত প্রতিনিধি দের কাছে মধ্যস্থতার জন্য উভয় পক্ষই আবেদন করে ।

<u>আলুর বাজার</u>

এখানে আলুর বাজার বলতে চাষিরা যেখান থেকে বীজ আলু ক্রয় করে ও উৎপাদিত আলু বিক্রয় করে তা বোঝানো হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে চাষিরা সাধারণত গ্রামের বা পাশের গ্রামের আলু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আলুর বীজ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার কীটনাশক ক্রয় করে থাকে; অন্যদিকে উৎপাদিত আলু বিক্রয়েও ও ক্ষেত্রেও ঐ ব্যবসায়ীদের কাছ করে। অন্যদিকে কিছু অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল চাষি যারা চন্দ্রকোণা রোড আলুর বীজ ক্রয় করে থাকে। তবে এই ধরনের চাষি বেশিরভাগ গ্রামের নেই বললেই চলে। চন্দ্রকোনা রোড থেকে ঘাটাল গামী রাস্তায় প্রায 500 মিটার জুড়ে রাস্তার দুই ধারে আলুর চাষের শুরুতে আলু বীজ বিক্রয়ের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী শখানেক দোকান গড়ে ওঠে।

চিত্র নম্বর-09: আলুর বাজার

চিত্র নম্বর-10: আলুর বাজার

এখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা পাঞ্জাব থেকে উন্নত মানের বীজ নিয়েছে প্রত্যেক বছরই বিক্রয় করে। এই অস্থায়ী দোকানগুলি প্রায় একমাস কখনো কখনো তারও বেশি খোলা থাকে। এখান থেকে পার্শ্ববর্তী চন্দ্রকোনা ব্লক সহ অন্যান্য এলাকার গ্রামীণ ব্যবসায়ী ও অবস্থাপণ্য চাষীগণ এদের কাছ থেকে বীজ ক্রয় করে। গ্রামের ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আলু কিনে গ্রামে তাদের কাছ থেকে দাদন নেয়া আলু চাষীদের এই বীজ বিক্রয় করে।

আলুর বীজ ও উৎপন্ন আলুর দাম প্রতিবছর ব্যাপক হারে বারা কমা করে, বিশেষ করে বীজের চাহিদা সহজলভ্যতা ছাড়াও কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দুর্নীতির জন্য অনেক সময় চাষীদের বেশি দামের আলু বীজ কিনতে হয়। একি সিজনের বিভিন্ন সময় আলুর বীজের মূল্য পার্থক্য থেকেই এই ব্যাপারটি সহজে বুঝা যায় বিভিন্ন সিজনে মূল্য ৮০০ থেকে ছয় হাজার পর্যন্ত ওঠানামা করতে দেখা যায়। যেখানে পাঞ্জাবে আলোর বীজ এর মূল্য পরিবহন খরচা সহ 800 থেকে 1200 টাকা সেখানে এই বীজ এই অঞ্চলের চাষীদের অনেক সময় 5000 থেকে 6000 টাকায় কিনতে হয়।

চিত্র নম্বর-11: ক্ষেত্রসমীক্ষা

আলু বিক্রির ক্ষেত্রে আগেই বলা হয়েছে যে কৃষকরা যেই ব্যবসায়ীর কাছে দাদন নিত তাকেই বাজারের তুলনায় কম মূল্যে আলো বিক্রয় করতে বাধ্য হত।

চিত্র নম্বর-12: ব্যবসায়ীর শ্রমিকরা কৃষকদের জমি থেকে ওজন করে নিয়ে যাচ্ছে।

কিছু চাষি যারা নগদ অর্থে চাষ করতে সমর্থ্য এইমাত্র তারাই নিজেদের পছন্দমত জায়গায় ও সময়ে আলু বিক্রয় করতে পারত।

<u>আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা</u>

আলু একটি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য হলেও আলু ব্যাপকভাবে পচনশীল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে আলু খাবারের উপযুক্ত রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। আলু একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হলেও সারা বছরই খাদ্যদ্রব্য হিসাবে আলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। তাই সারা বছরের আলুর যোগান নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার জন্য আলু সংরক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যে আলু আলুর প্রয়োজন। চন্দ্রকোণা II ব্লকের প্রায় 14 টি কোল্ড স্টোরেজ বর্তমান । সাধারণভাবে কৃষকরা আলু তোলার সময় 50 কেজি বস্তায় ভরে কোল্ড স্টোরেজে

আলু রাখে। সর্বনিম্ন 10 বস্তা আলু আলু রাখা যায় আলু রাখার বিনিময়ে কোল্ড স্টোরেজ একটা নির্দিষ্ট মূল্য নেয় যা আলোচ্য সময়ে 85 থেকে বেড়ে 90 হয়েছে।

চিত্র নম্বর-13: কোল্ড স্টোরেজ

ছাড়াও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তিন মাস কৃষক কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু বার করতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ভাগচাষী ও অন্যান্য ছোট চাষিরা তারা দাদন নিয়ে চাষ করেছে, তারা আলু সংরক্ষণ সেই অর্থে করতে পারে না। কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখলে অনেক সময় চাষিরা অনেক বেশি মূল্য পেতে পারতো কারণ বছরের বিভিন্ন সময়ের চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে সঙ্গে আলুর দামের পার্থক্য হয় 2019 এর উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যেখানে মাঠে এক বস্তা আলুর মূল্য 400 থেকে 500 টাকা ছিল সেখানে কোল স্টোরে যে রাখার পর আলুর সর্বোচ্চ মূল্য 3300 টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে আলু সংরক্ষিত রাখতে পারলে লাভ হবার সম্ভাবনা কতটা বেড়ে যায়। কিন্তু গ্রামগুলিতে একটি কথা প্রচলিত আছে 'জোয়া খেলা ও আলু চাষ দুই সমান' কারণ প্রত্যেক বছর আলু থেকে যে লাভ পাওয়া যাবে তার

কোন নিশ্চয়তা নেই। এমন অনেক বছরই দেখা গেছে যেখানে আলোর মূল্য দিয়ে রাখার পর এতটাই কমে গেছে যে আলু চাষের খরচ তো ওঠেনি এমনকি কোল্ড স্টোরেজের সংরক্ষণের ভাড়া থেকেও কম মূল্যে এক বস্তা আলু বিক্রি করতে চাষিরা বাধ্য হয়েছে। স্বভাবতই বেশিরভাগ চাষী কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখতে চায়না। কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখতে শুধু কোলস্টোরেজ ভাড়া বাবদই খরচ হয় না। এর সঙ্গে জমি থেকে কোলস্টোরেজ পর্যন্ত বহন খরচ আলুর বস্তার মূল্য ও বাছাই করার মূল্য যোগ হয়। আমাদের আলোচ্য সময়ে কোল্ড স্টোরেজের ভাড়ার সঙ্গে এই মূল্য প্রতি বস্তায় প্রায় 100 থেকে 150 টাকা হয়। পার্থক্যের কারণ প্রত্যেকটা জমি থেকে কোল্ডস্টোরেজ যাওয়ার দূরত্ব এবং খরচ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাদের খরচের পার্থক্য হয়ে যায়। তাই আলু কোল্ডস্টোরে থেকে বিক্রয় মূল্য উৎপাদনের সময় যে বিক্রয় মূল্য ছিল তার থেকে ন্যূনতম আড়াইশো টাকা বেশি না হলে কোন লাভ হয় না।

উপসংহার

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার ও ভূমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়ার ফলে তার সুফল গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষ গুলোর কাছেও পৌঁছাবে। যদিও তারা তাদের ন্যায্য অধিকার কতটা লাভ করতে পেরেছিল তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কৃষি জমি পুর্নবন্টন ফলে কৃষি জমির হস্তান্তর ও বন্টনের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছেও কিছুটা হলেও পৌঁছাতে পেরেছিল। এছাড়াও কৃষি মজুরের মজুরি বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের হাতে কিছু অতিরিক্ত অর্থ পৌঁছায়। যদিও অনেক কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় বর্গাদার কেই উচ্ছেদ করা হয়েছে তার নাম নথিভুক্তের আগেই। কিন্তু রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও অন্যান্য জীবিকার উন্নতির সাথে সাথে জমির সঙ্গে চাষীর সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র চাষীরাও পরের জমি ইজারা নিয়ে জমি ভোগ দখলের অধিকার পেয়েছে। 90 দশকের পর থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যগুলির ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন হয়। যার সুফল এই অঞ্চলের মানুষও লাভ করে কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উন্নত বীজ রাসায়নিক সার ও

কীটনাশক এর ব্যবহার এর ফলে কৃষির উন্নতি সাধন হয়। কৃষি বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে লাভের পরিমাণও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ফলে ভূমিহীন কৃষকরা যারা অন্য কোন উৎস থেকে অর্থ লাভ করেছে তারা কৃষি জমিতে তার নিবেশ ঘটায়। চন্দ্রকোণা II ব্লকের একটা বড় শতাংশের শ্রমিক সোনার কাজে রাজ্যের বাইরে যায় সেখান থেকে নিয়মিত অর্থ গ্রামগুলিতে আসে ফলে এই অর্থের একটা নির্দিষ্ট বড় পরিমাণ জমিতে ব্যবহার করা হয়। তবে অস্বীকার করা যাবে না যে আলু চাষ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক মূল চালিকাশক্তি এবং কৃষক পরিবার গুলির অর্থনৈতিক পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও আলুর উৎপাদন ও মূল্যের নিশ্চয়তা না থাকায় দরিদ্র কৃষকরা আলু চাষ করে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে।

তবে একটি নিরপেক্ষ সমীক্ষায় দেখা যায় যে শুধুমাত্র কৃষির কারণে গ্রামগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে এটা বলা যায় না। কৃষি মজুরের মজুরি বৃদ্ধি এবং কৃষি ছাড়া অন্য জীবিকা থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামগুলির অর্থনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে। এর জন্যেই কৃষি জমি ইজারা দেয়া ক্ষেত্রে নগদ অর্থে ইজারার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আলু চাষ এর ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এতটা বাড়েনি বা স্থিতিশীল হয়নি যে গরীব চাষীদের আয়ের স্থিরতা আনতে পারে। অন্য জীবিকা থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমি ইজারা নেয়ার প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে খাজনা চুক্তির মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল কারণে গরিব চাষীদের পক্ষে ইজারা নিয়ে আলু চাষ করা খুব বেশি লাভজনক হচ্ছে না। সমীক্ষায় দেখা যায় অনেক জায়গাতেই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের উন্নতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে প্রকৃতপক্ষে কৃষকদের উন্নতি কতটা হয়েছে বলা বাহুল্য।

তথ্যসূত্র

1. Yin, Steph (2016-11-18) "Who First Farmed Potatoes Archaeologists in Andes Find Evidence". The New York Times, ISSN 0362-4331
2. Potato Rebeca Early, Bloomsbury academic, New York, 2619, In India, The British hyped potatoes to justify colonialism By Atlas obscuras, April 9, 2019.
3. In India, The British hyped potatoes to justify colonial By: Atlas obscora, April 9, 2019, History of science, philosophy and culture in Indian civilization-General Editor DP Chattopadhyaya, Concept publishing company, page:150
4. রতিকান্ত ত্রিপাঠী- বাংলার শিলা ও তাম্রলিপিডে সমায়া ও সংস্কৃতি, Dry publication, 2012.
5. In India, The British hyped potatoes to justify colonialism- By Atlas obscuras, April 9, 2019, History of science, philosophy and culture in Indian civilization-General Editor D.P Chattopadhyaya, Concept publishing company, page:150
6. History of science, philosophy and culture in Indian Civilization-General Editor DP. Chattopadhyaya, Concept publishing company, page: 150.
7. In India, The British hyped potatoes to justify colonialism By Atlas obscura, April 9, 2019.
8. When the British wanted Lalbagh to feed their soldiers-Suttha Muttha Saturday, 25th Jamary 2014
9. Statistical fragments on Mysore by Ur Benjamin Heyne Bangalore: Mysore Government press, 1864.
10. Mistery of science, philosophy and culture in India civilization- General Editor. P.Chattopadhyaya, concept publishing company, page: 151
11. Potato- Rebecca Early, Bloomsbury academic, New Yeck, 2019,
12. Life and Food in Bengal-Chitrita Banerjee, Penguin buries 2005.

13. উৎস প্রায়- "Culinary culture in colonial India' Cambridge University, 2015, page:42
14. KT Achaya The illustrated Foods of India, Oxford University press, 2009
15. Collean Taylor Sen- Feasts and Fasts: A History of Food in India, Reaktion books, 2014,
16. In India, The British hyped potatoes to justify colonialism- By Atlas obscuras, April 9, 2019